হানবালি উসুল-১ [কুর’আন ও সুন্নাহ]

মুহাম্মাদ আবু যাহরা

কিতাবুল্লাহ

কিতাবুল্লাহ বা আল কুর'আন হচ্ছে শরিয়ার ভিত্তি এবং প্রধান উৎস। এর মধ্যে মৌলিক ভিত্তি এবং আইনকানুন বিদ্যমান যেগুলো স্থান-কাল-পাত্রভেদে বদলায় না এবং এগুলো কোন বিশেষ দলের জন্য প্রযোজ্য এবং অন্যের জন্যে নয়- এমন নয়। এর মধ্যে সার্বজনীন নিয়মকানুন, সঠিক ইসলামী আকিদাহ এবং দ্বীনের স্পষ্ট/নির্দিষ্ট হুজ্জাহ [প্রমাণ] বিদ্যমান।

যেহেতু এটি ইসলামী শারিয়ার প্রধান উৎস, আলিমরা সবসময়ই কুর'আন নিয়ে পড়াশোনা এবং এর কথা, ইঙ্গিত এবং ভাষ্য থেকে হতে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে আইনকানুন [মাস'আলা] বের করার ব্যাপারে নিয়োজিত থেকেছেন, যেভাবে তাঁরা অস্পষ্টগুলো ব্যাখ্যা করার জন্যে, আম'কে [সাধারণ] সংজ্ঞায়িত করতে, যে বিষয়গুলো পরিস্কার করা প্রয়োজন সেগুলো পরিস্কার করে, আম [সাধারণ] এবং খাস [বিশেষ] পরিভাষাগুলো ব্যাখ্যা করতে এবং রহিতকারি ও রহিত আয়াতগুলো খুঁজে বের করা এবং রহিতকরণের কারণ, আর কিভাবে তা হয় সেগুলো নিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আলিমরা এগুলোর বিস্তারিত ব্যাপারস্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন যদিও তাঁরা সবাই একমত যে কুর'আন হচ্ছে সকল ইসলামী আইনের প্রধান উৎস। তাঁরা এই পয়েন্টটিতে দ্বিমত প্রকাশ করেন না; তবে তাঁরা কুর'আনের সাথে সুন্নাহর সম্পর্ক নিয়ে, এবং সুন্নাহ কি বাড়তি প্রভাবক নাকি শুধু এর বাড়তি অংশ- সে ব্যাপারে তাঁরা একমত নন।

আমরা এই বিষয়ের গভীরে ডুবে যেতে চাইনা, যেহেতু ইমাম আহমদ এটা নিয়ে গভীরে যাননি, তবে একটি ব্যাপার আমাদের অবশ্যই আলোচনা এবং পরিস্কার করতে হবে, সেটা হচ্ছে কুর'আনের সাপেক্ষে সুন্নাহর মর্যাদা নিয়ে ইমাম আহমদের অবস্থানঃ মাস'আলা বা আইনকানুন বের করার ক্ষেত্রে সুন্নাহ কি কুরআনের সমান নাকি দ্বিতীয় পর্যায়ের? কোন আলিমই সুন্নাহকে কুরআনের একদম সমান মর্যাদার হিসেবে গণ্য করেননি। আলিমগণ একমত যে সুন্নাহর অবস্থান কুর'আন থেকে নিম্নে, কেননা কুর'আন হচ্ছে ইসলামের প্রধান হুজ্জাহ [প্রমাণ] এবং প্রথম উৎস। কিন্তু সুন্নাহ যে প্রধান প্রমাণ সেটা আল্লাহ্‌র বাণী দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত- "আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, তাদের সে বিষয়ে কোন পছন্দ থাকবে।" [৩৩:৩]; "এবং রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। [৫৯:৭]" এবং "যে লোক রসূলের হুকুম মান্য

করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। [৪:৮০]” এছাড়া আরও আয়াত রয়েছে যেগুলো সুন্নাহর প্রমাণ হওয়া ইঙ্গিত করে, কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে এর অবস্থান কুর'আন থেকে নিচে।

আইনকানুন বা মাস'আলা বের করার ক্ষেত্রে সুন্নাহর অবস্থান কুর'আনের নিচে- প্রশ্ন এই ব্যাপারে নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু কি সুন্নাহর মাধ্যমেই কুর'আন হতে আইনকানুন বের করা যাবে, যে সুন্নাহর কাজ হচ্ছে কুর'আনকে ব্যাখ্যা করা? হানাফিরা এবং মালিকিরা কুর'আন থেকে আইনকানুন বের করেছেন এবং আহাদ হাদিসগুলোকে এর বিপরীতে বিবেচনা করেছেন। তাঁরা যেগুলো কুর'আনের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে, সেগুলো গ্রহণ করেছেন এবং বাকিগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন। হানাফিরা এটি প্রতিনিয়ত করেছেন এবং মালিকিরা করেছেন মাঝে-মধ্যে, যেমন তাঁরা কুকুরের লেহন করা পাত্র ৭ বার ধোয়ার হাদিসটিকে গ্রহণ করেননি, কেননা সেটা কুর'আনের বিপরীতে যায়।

শাফিইইগণ কুর'আনের আক্ষরিক ভাব সুন্নাহর বিপরীত হলে সেটাকে পরিস্কার করার জন্যে সুন্নাহ ব্যবহার করেন। সুন্নাহ মাঝেমধ্যে কুর'আনের আক্ষরিক ভাষ্যকে খাস [নির্দিষ্ট] এবং সেভাবে কুর'আন বোঝা হয়। এটি কুর'আনের ভাষ্যকে ব্যাখ্যা এবং পরিস্কার করে তোলার ভুমিকা পালন করে, তাই এক ফকিহ বলেছেন যে সুন্নাহ কুর'আনের প্রতিনিধিত্ব করে কেননা সুন্নাহ হচ্ছে কুর'আনকে ব্যাখ্যা করা, বিস্তারিত করা, কোনটা মানসুখ [রহিত] সেটা পরিস্কার করা এবং কোনটা অনির্দিষ্ট তা সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যম। এজন্যে ইমাম শাফি কুরআন এবং সুন্নাহকে একই ধাপে রেখেছেন, কেননা দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে পরিস্কার করে। ইমাম আহমদের মতও একই এবং ইবন কায়্যিম সঠিকভাবে বলেছেন যে ইমাম আহমদ মাস'আলা পরিস্কার করে তোলার ক্ষেত্রে কুর'আনকে সুন্নাহর উপরে স্থান দিয়েছেন।

ইমাম আহমদ রাসুলের সুন্নাহকে কুর'আনের ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচনা করতে নারাজ হয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেননি যে কুর'আন এবং সুন্নাহর আক্ষরিক ভাষ্যর মধ্যে বিরোধ থাকতে পারে, কেননা সুন্নাহ কুর'আনকে পরিস্কার করে তোলে এবং কুর'আনে যেসকল আইনকানুন রয়েছে সেগুলো ব্যাখ্যা করে। তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন যেখানে তিনি যারা [কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে] কুর'আনের আক্ষরিক অর্থ নিয়ে সুন্নাহকে বাদ দিয়ে দেয় তাদের রদ করেছিলেন। তিনি শুরু করেছিলেন এই বলে-

“সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রাসুল (সা)-কে 'হিদায়াহ এবং সত্যের দ্বীন দ্বারা পাঠিয়েছিলেন অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয় লাভের জন্যে, বহুশ্বরবাদিরা সেটা অপছন্দ করলেও। তিনি তাঁর কিতাব রাসুলের নিকট নাজিল করেছিলেন হিদায়াহ এবং আলো হিসেবে তাদের জন্যে যারা এটিকে অনুসরণ করে এবং রাসুল (সা)-কে শিখিয়েছিলেন তিনি এর ভেতরে এবং বাইরে থেকে তিনি কি চান, আম এবং খাস, মানসুখ [রহিত] এবং রহিতকারী এবং এই বই কি বুঝিয়েছে/চেয়েছে। রাসুল (সা) আল্লাহ্র কিতাব ব্যাখ্যা করেছেন এবং এর অর্থগুলো বের করেছন। তাঁর সাহাবিগণ, যাদের উপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং যাদের তিনি তাঁর রাসুলের [সঙ্গী হিসেবে] জন্যে বাছাই করেছিলেন, তাঁরা এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাঁর হতে এটি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা ছিল আল্লাহ্র রাসুলের (সা) ব্যাপারে এবং আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে কি বুঝিয়েছেন- সে ব্যাপারে সরাসরি সাক্ষী থাকার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী। আল্লাহ্র রাসুলের মৃত্যুর পর তাঁরা ব্যাখ্যা করেছিলেন আল্লাহ্র কিতাব দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে।”

এই অনুচ্ছেদটি তিনটি জিনিস ফুটিয়ে তোলে- প্রথমত, কুর'আনের বাহ্যিক ভাষ্যর সুন্নাহের উপর প্রাধান্য নেই, এটা পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাসুলুল্লাহ (সা) কুর'আনকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাঁর পরে কেউ এটিকে ব্যাখ্যা করতে পারবেনা কেননা সেটা শুধু সুন্নাহরই ভুমিকা, এবং এটা অন্য উপায়ে করা যাবেনা। তৃতীয়ত, সাহাবিরা (রা) কুর'আনকে ব্যাখ্যা করেছেন কেননা তাঁরা এটি রাসুলুল্লাহ (সা) হতে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন; তাঁরা কুর'আন নাযিলের সাক্ষি এবং এর ব্যাখ্যা শুনেছেন এবং তাঁরা রাসুলের (সা) সুন্নাহ জানতেন, তাই তাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে সুন্নাহরই অংশ। এভাবে ইমাম আহমদ পরিস্কার করে দিয়েছেন যে আসার [বর্ণনা] ছাড়া কুর'আনের তাফসির নেই। ইবনে তাইমিয়া তাঁর তাফসির সংক্রান্ত গ্রন্থে বলেছেন যে, যদি কোন আয়াতের ব্যাপারে সাহাবীদের (রা) হতে তাফসির (ব্যাখ্যা) না থাকত, তাহলে তিনি সেটা মাঝেমধ্যে তাবিই'দের হতে নিতেন। তিনি মতের দ্বারা কুর'আনের ব্যাখ্যা করা আয-জামখাশারি এর মত অপছন্দ করেছেন।

এটি আমাদেরকে নিয়ে যায়- যেখানে রাসুল (সা)-র শিক্ষা নেই, সেখানে সালাফদের বর্ণনা হতে কুর'আন বোঝার ব্যাপারে ইমাম আহমদ ইবনে হানবালের (র) অবস্থানে নিয়ে যায়। তিনি বলেছেন যে, তিনি মনে করতেন না যে কুর'আনের আক্ষরিক ভাষ্য সুন্নাহকে রদ করতে পারে। সুন্নাহ হচ্ছে যা কুর'আনের প্রমাণকে খাস বা নির্দিষ্ট করে, তাই এটি সম্ভব না যে, সুন্নাহ হতে এমন কিছু আসা যেটা কুর'আনের সাধারণ অর্থের সাথে সাংঘর্ষিক।

কুর'আনের সাথে সম্পর্কের সাপেক্ষে ইবনে কায়্যিম সুন্নাহকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন এবং বলেছেন, "কুর'আনের ক্ষেত্রে সুন্নাহর তিনটি দিক রয়েছে। প্রথমত, সুন্নাহ কুর'আনের সাথে সকল দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সুন্নাহ একই মাস'আলার ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা প্রদান করে, এবং তাই এটি হচ্ছে একাধিক প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, এটি কুর'আন কি বুঝিয়েছে সেটা ব্যাখ্যা এবং পরিস্কার করে তোলে। তৃতীয়ত, এটি এমন কিছুর ব্যাপারে মাস'আলা প্রদান করে যেখানে কুর'আন কিছু বলে নি, অথবা এমন কিছুকে নিষেধ করে যেখানে কুর'আন নীরব। কুর'আন এই মূলনীতিটি প্রতিষ্ঠা করে যে রাসুল (সা)-কে মান্য করতে হবে এবং কারও জন্যে তাকে অমান্য করা জায়েজ না। এটি কুর'আনের উপর সুন্নাহকে স্থান দেওয়া নয়, বরং কুর'আনে আল্লাহ্ রাসুলের (সা) প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন, সেটা নিশ্চিত করা।"

ইমাম আহমদের (র) মাজহাবের অবস্থান হচ্ছে কুর'আনের প্রকাশ্য ভাষ্য কেবল সুন্নাহ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে। আর ইমাম শাফিইও (র) এটি অনুসরণ করেছেন, যেমনটি তিনি তাঁর আল-রিসালাহ গ্রন্থে বলেছেন। ইমাম আহমদ (র) মক্কাতে ইমাম শাফিইকে (র) শোনা/তাঁর নিকট শেখার সময় এই অবস্থান গ্রহণ করে থাকতে পারেন। ইমাম আহমদ (র)-এর অবস্থান সমর্থনে ইবনে কায়্যিম (র) বলেছেন-

"যদি অন্য কারও কুর'আনের বুঝের জন্যে রাসুল (সা)-র সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করা জায়েজ হত, তাহলে অনেক সুন্নাহ প্রত্যাখিত হত এবং পুরোপুরি বাতিল হয়ে যেত। তাই সাধারণ এবং অনির্দিষ্ট ভাষ্যর প্রতি কারও কোন অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় যে অবস্থান কোন গ্রহণযোগ্য সুন্নাহর বিপরীত এবং সুন্নাহ গ্রহণ করতে অস্বীকার করা, যেমনটি রাফেজি শিয়ারা এই হাদিসটি প্রত্যাখ্যান করেছেন- "আমরা, রাসুলের সাহাবিরা (রা) কোন উত্তরাধিকার রেখে যাইনা", এই আয়াতের সাধারণ ভাবের কারণে- "আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেনঃ একজন ছেলে দুজন মেয়ের সমান অংশ পাবে।" [৪/১১]

সুন্নাহ

সুন্নাহ হচ্ছে ইমাম আহমদের [ফিকহের ক্ষেত্রে] দ্বিতীয় মূলনীতি, অথবা আরও যথাযথভাবে বললে প্রথম মূলনীতির দ্বিতীয় অর্ধাংশ। যখন ইবন কায়্যিম ইমাম আহমদের (র) মূলনীতিগুলো উল্লেখ করেছেন, তিনি গ্রহণযোগ্য নস' [ভাষ্যকে] একটি মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং কুর'আন এবং সুন্নাহ মিলে একটি মূলনীতি বিবেচনা করেছেন। এর পেছনের প্রজ্ঞা সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছেঃ সুন্নাহ কুর'আন এর ব্যাখ্যাকারী এবং সহায়তাকারী, তাই দুটোর মধ্যে বিরোধ থাকতে পারে না কারণ হচ্ছে একটি অপরটিকে ব্যাখ্যা করে। কুর'আন যে প্রধান উৎস- এই ব্যাপারটার সাথে এটি সাংঘর্ষিক নয় কেননা এটি পরিস্কার যে কুর'আন হচ্ছে সকল আইনের ভিত্তি।

কিন্তু আমরা ইমামুস সুন্নাহ সম্পর্কে পড়াশোনা করছি, যে সুন্নাহ তিনি সারাজীবন ধরে রেখেছেন, তাই আমাদের অবশ্যই হানবালি ফিকহে কিতাবুল্লাহর পাশাপাশি সুন্নাহর অবস্থান সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে। এটি ইমাম আহমদের (র) দৃষ্টিকোণ আরও পরিস্কার করে তুলবে। তিনি প্রায়ই বলতেন যে কুর'আনের জ্ঞান কেবলমাত্র সুন্নাহর মাধ্যমে অর্জন করা যায়; দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান সুন্নাহর মাধ্যমে আসে এবং ইসলামের ফিকহ এবং আইনকানুন সুন্নাহর মাধ্যমে সহজে পাওয়া যায়। যারা সুন্নাহর সাহায্য ছাড়া কুর'আনের আইনকানুন ব্যাখ্যায় নিজেদের নিয়োজিত করবে, তাঁরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে। এর পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে-

- কুর'আনের ভাষ্য অনুসারে রাসুল (সা)-র অনুগত হওয়া বাধ্যতামূলক, আর আনুগত্য এর মানে কেবল হতে পারে তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করা এবং তিনি তাঁর জীবনে যা যা করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নিকট থেকে যা যা বর্ণিত হয়েছে তা হতে রায় গ্রহণ করা। এটা দ্বীনে সুপ্রতিষ্ঠিত, কেননা আল্লাহ্ বলেছেন, "কিন্তু না, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে।" [৪/৬৫]। এই আয়াত নাজিল হয়েছিল যখন রাসুলুল্লাহ (সা) আয-যুবাইর ইবনে আওওয়াম এর পক্ষে রায় দিয়েছিলেন, আনসারিদের সাথে বিতর্কে যে কে একটি খাল থেকে আগে পানি পাবে। আয-যুবাইর [রা]-র ভিটে পানির নিকটবর্তী ছিল। যখন আনসারিরা এই রায় দ্বারা নাখোশ হয়েছিল, তখন আয়াতটি নাযিল হয়। আরও অনেক আয়াত এই বাধ্যতামূলক হওয়াকে ইঙ্গিত করে, যেমন- "আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর

এবং রাসুলের আনুগত্য কর” [৫/৯৩] এবং “রাসুল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক।” [৫৯/৭]

- দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে সুন্নাহ অনুসরণ করার ক্ষেত্রে এবং [শুধু] কুর'আনের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না করা সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে হাদিসে যেসকল প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসুল (সা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন, “তোমরা বলবে যে, এটি আল্লাহ্‌র কিতাবঃ এর মধ্যে যা যা জায়েজ [বলা হয়েছে], আমরা সেগুলোকে জায়েজ হিসেবে বিবেচনা করি, এবং যা যা এর মধ্যে নাজায়েজ, আমরা সেগুলোকে নাজায়েজ হিসেবে বিবেচনা করি। যাদেরকে আমার নিকট হতে কোন হাদিস বলা হয়, এবং সে এটা অস্বীকার করে, সে তিনজনের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে- আল্লাহ্‌, তাঁর রাসুল এবং যে তাঁর নিকট হাদিসটি বর্ণনা করেছে।” তিনি আরও বলেছেন যে, “এমন এক সময় আসবে যখন তোমরা বাহনে আয়েশ করবে এবং আমার নিকট হতে তোমাদের কোন হাদিস বলা হলে বলবে যে, ‘আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র কিতাব। এর মধ্যে যা যা জায়েজ, আমরা সেগুলোকে জায়েজ হিসেবে মনে করি, এবং যেগুলো না জায়েজ, সেগুলোকে নাজায়েজ হিসেবে মনে করি [অর্থাৎ তাঁরা সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করে পথভ্রষ্ট হবে]।’” এই ভাষ্যগুলো ইঙ্গিত করে যে রাসুলের (সা) সুন্নাহতে দ্বীনের আইনকানুন তালাশ করা ওয়াজিব এবং শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাবে নিজেকে আবদ্ধ করা হচ্ছে বিদ'আত।

- তৃতীয় কারণ হচ্ছে, অনেক ইসলামী আইনকানুন বা মাস'আলা যেগুলোর ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর বেশিরভাগ একমত, সেগুলো সুন্নাহ থেকে গৃহীত অথবা সুন্নাহর উপর বিশালভাবে নির্ভরশীল। দুধপানের মাধ্যমে স্থাপিত সম্পর্কের কারণে বিয়ে নিষেধ হওয়া এবং একসাথে কোন নারী এবং তাঁর খালা/ফুপুকে বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়া হচ্ছে সুন্নাহর অংশ। সালাত, যাকাত, এবং হজের বিস্তারিত আইনকানুন হচ্ছে সুন্নাহর অংশ। রক্তপণের পরিমাণ এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ সুন্নাহতে বিস্তারিত। তাই যে সুন্নাহ হতে ফিকহকে এড়িয়ে যায়, সে ইসলামের ফিকহ বা আইনকানুনের ১০ ভাগের ৯ ভাগই হারিয়ে ফেলে।

এতদসত্ত্বেও, অবশ্যই পরিস্কার করে বলা উচিত যে, সকল সুন্নাহ সনদের কর্তৃত্বের দিক থেকে একই নয় এবং আমাদের জন্যে এগুলোর আপেক্ষিক অবস্থান, এগুলো থেকে কি পরিমাণে আইনকানুন উদ্ভুত করা যায়, যখন কোন বিরোধ থাকে [হাদিসের পাঠের মধ্যে] সেক্ষেত্রে কি হবে,

এবং ইমাম আহমদের এই ব্যাপারে অবস্থান পরিস্কার করে তোলা জরুরি। ফকিহগণ হাদিসকে সনদের দিক থেকে চারটি প্রকারে ভাগ করেছেনঃ মুতাওয়াতির হাদিস, মাশহুর [সুপরিচিত] হাদিস, আহাদ হাদিস [যে হাদিসের বর্ণনাকারী একজন], এবং যেসকল হাদিসের সনদ সম্পূর্ণ নয়, কোন এক পর্যায়ে গিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছে।

মুতাওয়াতির হাদিস হচ্ছে অনেক মানুষ হতে বর্ণিত এবং অনেকগুলো আলাদা আলাদা জায়গায়, ফলে এই হাদিস অসত্য হতে পারে সেটা কল্পনা করা অসম্ভব। এরকম অনেক হাদিস রয়েছে। মুতাওয়াতির হাদিসের জ্ঞান অবিতর্কিত। মাশহুর হাদিস হচ্ছে সেগুলো, যেগুলো দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্ম গ্রহণ করেছে এবং যেগুলো তাদের মধ্যে সুপরিচিত/বিখ্যাত, এমনকি একজন রাবি দ্বারা বর্ণিত আহাদ হাদিস হলেও। আহাদ হাদিসে সুনিশ্চিত প্রমাণ প্রদান করে না। ইমাম আহমদ রাসুল (সা) এবং তাঁর সাহাবীদের ভালোবাসা দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং তিনি রাসুল (সা) এর প্রতি আরোপকৃত যেকোনো কিছুই গ্রহণ করতে তুষ্ট ছিলেন। চতুর্থ প্রকার হাদিস হচ্ছে মুরসাল হাদিস। মুরসাল দুটো অর্থ বহন করতে পারেঃ একটি হচ্ছে- এমন হাদিস যেটা কোন তাবিইতে গিয়ে শেষ হয়ে যায়, কোন সাহাবি (র) থেকে সে বর্ণনা করছে তাঁর নাম উল্লেখ না করেই। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এমন হাদিস যেটায় সনদ সরাসরি এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে রাসুল (সা) পর্যন্ত পৌঁছায় না। এগুলোর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে ফুকাহাদের ভিন্নমত বিদ্যমান।

ইমাম মালিক এবং ইমাম আবু হানিফা মুরসাল হাদিস নির্দিষ্ট পরিসরে গ্রহণ করেছেন, যতটুকুর মধ্যে তাঁরা সেটিকে গ্রহণযোগ্য বা সঠিক মনে করেছেন। মুওয়াত্তা এবং ইমাম আবু হানিফার সাথে সংশ্লিষ্ট আসারের বইগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে এটি পরিস্কার হয় যে, তাঁরা মুরসাল হাদিসকে আহাদ হাদিসের সমপর্যায়ের মনে করতেন। যখন তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিত তাঁরা সেই একই মূলনীতি প্রয়োগ করতেন, যেগুলো তাঁরা সাধারণভাবে দুটো হাদিস বা বর্ণনার মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন। এদের শক্তিমাত্রা তাদের মতে আহাদ হাদিসের মতই। তবে ইমাম শাফিই তাঁর মুসনাদে মুরসাল হাদিসকে একই মর্যাদার মনে করেননি। তিনিও মুরসাল হাদিসকে গ্রহণ করেছেন, তবে সেক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্তারোপ করেছেন।

ইমাম আহমদ মুরসাল হাদিসকে দলিলযোগ্য মনে করেছেন, তবে এর অবস্থান দিয়েছেন সাহাবীদের [রা] ফতওয়ার নিচে, দুর্বল হাদিসের সমান পর্যায়ের- এভাবে তিনি একইসাথে তাঁর শিক্ষক ইমাম শাফিই [র]-এর সাথে কিছু পরিসরে একমত হয়েছেন এবং কিছু পরিসরে দ্বিমত

পোষণ করেছেন। মুরসাল হাদিসকে সাহাবীদের [র] ফতওয়ার নিচে অবস্থান দিয়ে তিনি ইমাম শাফিই [র] এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন, কেননা তিনি সাহাবীদের ফতওয়াকে সুন্নাহর অংশ মনে করতেন, যেটা আমরা পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করব। যখন দলিলের জন্যে অন্যকিছু না থাকত, তিনি তখন মুরসাল হাদিস গ্রহণ করতেন, যেমনভাবে তিনি দুর্বল হাদিস গ্রহণ করতেন কারণ তিনি কিয়াস এবং রায় থেকে এগুলোর ব্যবহার করা প্রাধান্য দিতেন- কিয়াস এবং রায় কেবল শেষ সম্বল হিসেবে প্রয়োগ করতেন।

তবে এটা পরিস্কার যে ইমাম আহমদ মুরসাল হাদিসকে দুর্বল মনে করতেন- যে দলিল কিছু কিছু সময় রদ করা এবং গ্রহণ না করা যেতে পারে, যে কারণে তিনি সাহাবীদের [র] ফতওয়াকে উপরে স্থান দিয়েছেন। তবে, তিনি কখনোই সাহাবিদের [র] ফতওয়াকে কোন সহিহ হাদিসে উপরে স্থান দেননি, তাই মুরসাল হাদিসের উপরে সাহাবীদের [র] ফতওয়াকে স্থান দেওয়া প্রমাণ করে যে তিনি মুরসাল হাদিসকে দুর্বল মনে করতেন, সহিহ নয়। তিনি সেগুলো ব্যবহার করতেন কেবল অপরিহার্য ক্ষেত্রগুলোতে, কেননা তিনি দ্বীনের ব্যাপারে নিজ থেকে কোন ফতওয়া দিতে চাইতেন না যতক্ষণ না এমন কোন বর্ণনা উপস্থিত থাকত যার ব্যাপারে তিনি জানতেন। অতএব, তিনি ততক্ষণ এর ব্যবহার করতেন যতক্ষণ তাঁর নিকট সাহাবীদের [র] ফতওয়াস্বরূপ কিছু বিকল্প হিসেবে না থাকতো। অতএব আমরা বলতে পারি ইমাম আহমদের [র] মুরসাল হাদিসের গ্রহণ করার পরিসর মোটেই ইমাম শাফিই [র]-এর হতে বেশি ছিল না- বরং কিছু হলে, সেটা ছিল কম; কেননা তিনি এগুলোকে দুর্বল হাদিসের প্রকারের অধীন হিসেবে আরও অধিক প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইমাম আহমদ মিথ্যাবাদীদের নিকট হতে বর্ণনা করেননি, শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য মানুষদের হতে বর্ণনা করতেন- যারা সততার জন্যে পরিচিত ছিল। যারা তাকওয়া এবং সত্যবাদিতার জন্যে পরিচিত ছিলেন, তাদের নিকট হতে ইমাম আহমদ বর্ণনা করতেন। সুন্নাহর ব্যাপারে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে তিনি মুসাদ্দাদ ইবনে মুফাসসারা-আল বাসরির নিকট একটি চিঠিতে বলেনঃ “আমরা সুন্নাহকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে পৌঁছানো বর্ণনা হিসেবে মনে করি। সুন্নাহ কুরআনের ব্যাখ্যা এবং নিষ্পত্তি করে। সুন্নাহর প্রেক্ষিতে কিয়াস প্রয়োগ হয় না এবং সুন্নাহকে মানুষের মতামত এবং প্রবৃত্তির নির্ভরশীল করা যাবে না। এটা হচ্ছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অনুসরণ করা এবং প্রবৃত্তিকে প্রত্যাখ্যান করা।” তিনি সুন্নাহর গ্রহণযোগ্যতার জন্যে কোনো নিয়ম/নীতির সাথে সহমত পোষণ করাকে অথবা সেগুলোর আলোকে যাচাই করাকে শর্ত মনে

করেননি। তিনি সুন্নাহর কোনো অংশকেই প্রত্যাখ্যান করেননি, যদি না বিপরীত এমন আরেকটি সুন্নাহ পাওয়া যেত যেটি আগেরটি হতে অধিক শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য এবং আরও নির্ভরযোগ্য রাবিগণ সেটা বর্ণনা করেছেন।

আমরা দেখতে পাই যে, ইমাম আহমদ শুধুমাত্র তাদের নিকট হতে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন যারা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলার ব্যাপারে পরিচিত ছিল। তিনি তাকওয়াবানদের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন এবং তাদের হাদিসকে গ্রহণ করেছেন- এমনকি সেগুলো পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত না হলেও। কিন্তু যদি তিনি অধিক নির্ভরযোগ্য কাউকে পেতেন, তিনি তাঁর হাদিসের বর্ণনা/রূপ গ্রহণ করতেন। যেমনটি আমরা দেখেছি, ইমাম আহমদ দুর্বল হাদিস গ্রহণ করতেন- তবে এটি পরিস্কার তিনি শুধুমাত্র সেসকল রাবিগণকে গ্রহণ করতেন যারা মিথ্যা বলার জন্যে পরিচিত ছিল না। তিনি তাঁর সন্তান আব্দুল্লাহকে উপদেশ দিয়েছিলেনঃ "প্রায় কেউই তাঁর নিজ মতের প্রতি নির্ভর করে না যদি না তাঁর অন্তরে ত্রুটি থাকে। আমি মতের চেয়ে দুর্বল হাদিসকে প্রাধান্য দিই।" আব্দুল্লাহ বলেছেন, "আমি তাকে এমন পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যখন একমাত্র উপায় হচ্ছে দুজন ব্যক্তি- একজন হচ্ছে যার মধ্যে হাদিসের জ্ঞান আছে কিন্তু সে দুর্বলের মধ্য হতে সহিহ কোনটি তা জানে না, আর আরেকজন হচ্ছে যে মত প্রয়োগ করে- এদের মধ্যে কার নিকট হতে মাস'আলা জিজ্ঞেস করা উচিত? ইমাম আহমদ উত্তর দিয়েছিলেন হাদিসের ব্যক্তিটিকে, মতের ব্যক্তি নয়।"

ইমাম আহমদ কিয়াসের আগে দুর্বল হাদিসকে অবস্থান দিয়েছেন। তিনি তাঁর সন্তান আব্দুল্লাহকে বলেছিলেন, "আমার ছেলে, আমি দুর্বল হাদিসের বিরুদ্ধে যাই না, যদি না আমি সেটাকে রদ করার মত নিশ্চিত/শক্তিশালী কিছু পাই। ইমাম আহমদ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সংযুক্ত সনদের ঘাটতি আছে এমন হাদিস এবং মতামতের ক্ষেত্রে- যেটিকে [মত] তিনি দ্বীনের ক্ষেত্রে অপছন্দ করেছেন। তিনি দ্বীনের প্রতি সতর্কতাবশত কোন হাদিস অনুযায়ী কাজ করতে অধিক পছন্দ করেছেন, সেটিকে সহিহ হওয়ার ব্যাপারে ধারণা করে, যদি না বিপরীতে কোন প্রমাণ থাকত। তাছাড়াও, ইমাম আহমদ পূর্বযুগের কিছু ফকিহ, যারা বিদআতের পরিবর্তে আসার বা বর্ণনার অনুসরণ করার ব্যাপারে পরিচিত ছিলেন, যেমন- ইমাম মালিক, সুফিয়ান আস-সাওরি, ইমাম শাফি এবং অন্যান্য ফকিহ যাদের হাদিস/আসারের ব্যাপারে প্রচুর জ্ঞান ছিল- তাদের মত গ্রহণ করার মাধ্যমে নিজের মত গ্রহণ করা থেকে দূরে থেকেছেন। ইজতিহাদ করার ক্ষেত্রে তিনি এই পথ অনুসরণ করেছেন।

[মুহাম্মাদ আবু জাহরার ইমাম আহমদের জীবনীর "হানবালি ফিকহের মূলনীতি" অধ্যায় থেকে অনুবাদকৃত]

F. Khan
11.05.2019